একুশ শতকের জ্যোতির্বিজ্ঞান
সম্পাদনা : এ এম হারুন অর রশীদ ও মুনির হাসান

গ্রন্থস্বত্ব : সৃজনী সাধারণ স্বত্ব

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১০

তাম্রলিপি-১৩৫

পরিচালক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম
তাম্রলিপি
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষর বিন্যাস
সৃজনী
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এম আর প্রিন্টিং প্রেস
১১ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০

EKUSH SHOTOKER JOTIRBIGGYAN
Edited by A M Harun Ar Rashid & Munir Hasan
First Published : Octobor 2010, by A K M Tariqul Islam
Director : Tasnova Adiba Shanjute, Tamralipi, 38/2Ka, Banglabazar, Dhaka-1100,

Price : 200.00

ISBN : 984-70096-0135-4

একুশ শতকের জ্যোতির্বিজ্ঞান

স ম্পা দ না
এ এম হারুন অর রশীদ
মুনির হাসান

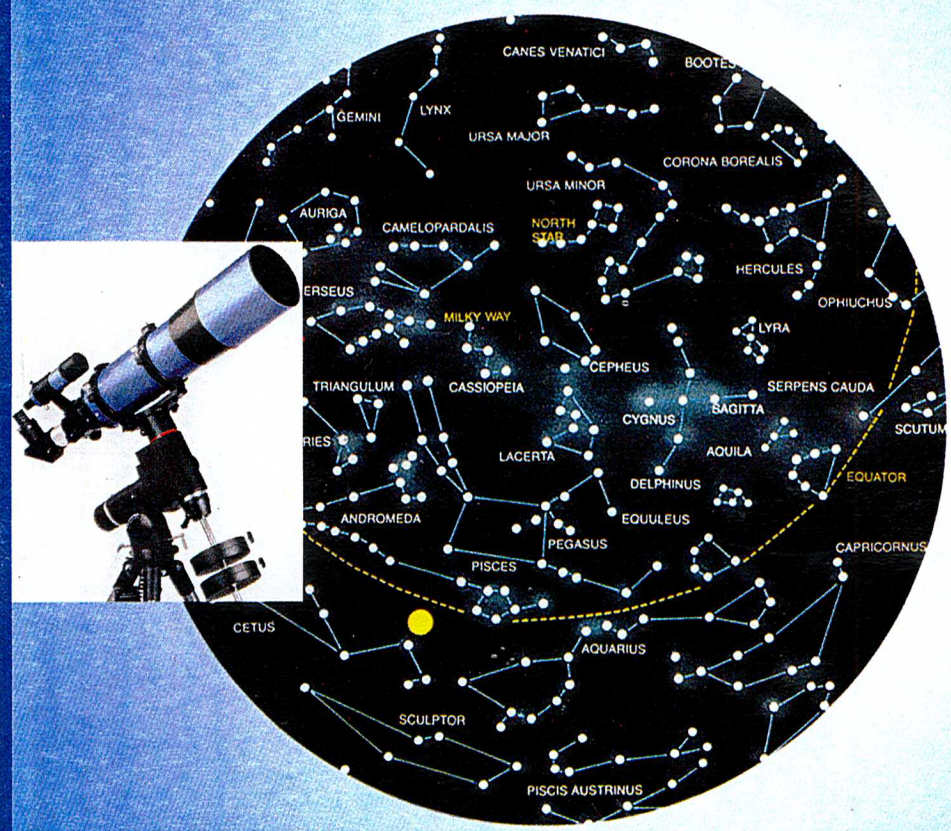

মহাবিশ্ব

সুলতানা এন নাহার
অনুবাদক : খান মুহাম্মদ

সারাংশ
আমরা এই মহাবিশ্বেরই অংশ। মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেয়ার জন্য এই লেখায় কেন্দ্রীন সংশ্লেষের মাধ্যমে আদিম মৌলসমূহের সৃষ্টি, তারা, কৃষ্ণবিবর ইত্যাদি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বস্তুর উদ্ভব এবং অতিনবতারা বিস্ফোরণের মতো ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন বস্তু থেকে আসা আলো বা অন্যান্য বিকিরণের বর্ণালি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এসব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা যায়।

ভূমিকা

পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশ পর্যন্ত গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত করাটা আমাদের জন্য সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ জ্যোতিষ্ক নিয়ে গবেষণার মাধ্যমেই আমরা মহাবিশ্বে নিজেদের অবস্থান বুঝতে পারি। আমরা নিজেরাই তো পৃথিবীর পিঠে চড়ে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আবর্তন করছি সূর্য নামের একটি মাঝারি আকারের তারাকে। পরের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদে মহাবিশ্বের পরিচয়টিই তুলে ধরা হবে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি

পর্যবেক্ষণ বলছে আমাদের মহাবিশ্বের একটি শুরু ছিল, ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে সৃষ্টি হওয়ার পর বেশ কয়েক ধাপে তার বিবর্তন ঘটেছে। মহা বিস্ফোরণ

তত্ত্বের মাধ্যমে এই সৃষ্টি ও বিবর্তণ ব্যাখ্যা করা যায়, এ যুগের বিভিন্ন আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণের সঙ্গে এই ব্যাখ্যা বেশ মিলেও যায়। মহা বিস্ফোরণের ঠিক পরের সময়টা নিয়ে অবশ্য আমরা খুব বেশি কিছু জানতে পারি নি, কিছুটা ধারণা করতে পেরেছি কেবল। মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল একটি অপরিমেয়রূপে ক্ষুদ্র, অসীম তাপ এবং অসীম ঘনত্ববিশিষ্ট শক্তির উৎস হিসেবে যাতে একটিমাত্র বল ছিল—অতিমহাকর্ষ। মহাবিশ্বের সে অবস্থাটিকে বলা হয় অনন্যতা (Singularity)। এই উৎস কোথা থেকে এল সেটা বিজ্ঞান এখনও ব্যাখ্যা করতে পারে নি। অতিমহাকর্ষ ভেঙে মহাকর্ষ এবং দুর্বল তাড়িত বল হওয়ার পরই সেই আদিম অনন্যতাটি খুব দ্রুত প্রসারিত হতে শুরু করে। এর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মহাবিশ্বের সূচকীয় (exponential) স্ফীতি শুরু হয়। মূলত এই সূচকীয় স্ফীতিকেই মহা বিস্ফোরণ বলা হয়। বিস্ফোরণের পর মহাবিশ্বের ধরণ-ধারণ একেবারেই বদলে যায়। তখন মহাবিশ্ব ছিল উচ্চ শক্তির ফোটনে পরিপূর্ণ। ফোটনগুলো খুব ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় ছিল এবং তাদের তাপমাত্রাও ছিল অনেক বেশি। এসব ফোটনের সংঘর্ষে কোয়ার্ক, গ্লুওন এবং অন্যান্য মৌলিক কণাগুলো উৎপন্ন হয়। আদিম উত্তপ্ত মহাবিশ্বে কণাগুলোর এই ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থাকে মহা বিস্ফোরণের "কণা স্যুপ" (Particle soup) নামে ডাকা হয়।

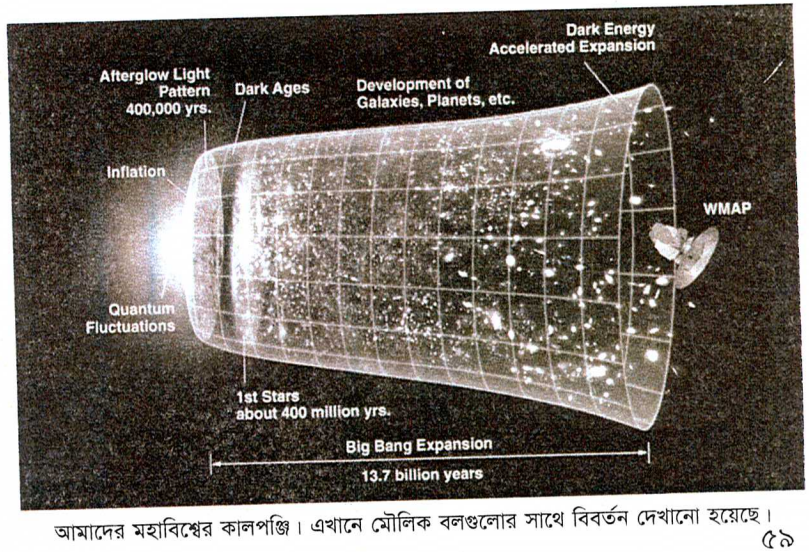

আমাদের মহাবিশ্বের কালপঞ্জি। এখানে মৌলিক বলগুলোর সাথে বিবর্তন দেখানো হয়েছে।

মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমেই স্থান এবং কাল এর সূচনা ঘটে। বিশ্বাস করা হয়, মহা বিস্ফোরণের আগে কোনো স্থান ছিল না এবং শূন্যতম সময়েই এই বিস্ফোরণটি ঘটেছিল। সুতরাং সবগুলো ছায়াপথকে নিয়ে স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে।

আদিম কেন্দ্রীন সংশ্লেষ

পদার্থ সৃষ্টির কিছুক্ষণের মধ্যেই আদিম কেন্দ্রীন সংশ্লেষ (Nucleosynthesis)-এর যুগ শুরু হয়। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এ যুগে প্রথম নিউক্লিয়াস তথা কেন্দ্রীন সৃষ্টি হয়েছিল। এর অপর নাম মহা বিস্ফোরণ কেন্দ্রীন সংশ্লেষ (Big Bang Nucleosynthesis-BBN, বিবিএন)। ধারণা মতে, মহা বিস্ফোরণের আনুমানিক ০.০১ সেকেন্ড পর এই যুগ শুরু হয়েছে আর শেষ হয়েছে ৩ মিনিট পর। আদিম মহাবিশ্বের কোয়ার্কগুলোর মধ্যে "আপ কোয়ার্ক" ২/৩ পরিমাণ ধনাত্মক আধান বহন করতো, আর "ডাউন কোয়ার্ক" ১/৩ পরিমাণ ঋণাত্মক আধান বহন করতো। বিবিএন-এর পূর্বে তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকায় কণাগুলো প্রচণ্ড গতিতে চলাচল করছিল যার কারণে নিউক্লিয়ন তৈরি সম্ভব হয়নি। আবার বিবিএন-এর শেষ দিকে তাপমাত্রা এতো কমে গিয়েছিল যে নিউক্লিয়ন তৈরি অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। পুরো সময় জুড়েই মহাবিশ্ব শীতল হতে থাকে এবং এ কারণে দুর্বল তাড়িত বল থেকে শক্তিশালী কেন্দ্রীন বল আলাদা হয়ে যায়। দুর্বল তাড়িত বল বিভক্ত হয়ে পরে আরও দুটি বলের জন্ম হয়—তড়িচ্চুম্বকীয় বল এবং দুর্বল কেন্দ্রীন বল। এ সময়ই কেন্দ্রীন বলগুলো দুটি আপ কোয়ার্ক ও একটি ডাউন কোয়ার্ক-এর সমন্বয়ে নিউট্রন তৈরি করতে সক্ষম হয়। প্রোটন ও নিউট্রনকেই একসাথে নিউক্লিয়ন বলা হয়। ব্যারিয়ন দ্বারাও প্রোটন এবং নিউট্রনকেই বোঝানো হয়। সে সময় কণাগুলোর গতি ছিল অনিয়মিত, দ্রুতি ছিল আপেক্ষিকতাভিত্তিক (relativistic), আর সংঘর্ষের মাধ্যমে সকল ধরনের কণা-প্রতিকণা জোড়া অবিরাম সৃষ্টি ও ধ্বংস হচ্ছিল। বিকিরণ ও পদার্থের মধ্যে তাপীয় সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সম্প্রসারণের কারণে মহাবিশ্বের তাপমাত্রার ক্রমহ্রাসই এই সাম্যাবস্থার কারণ। এরই মধ্যে ব্যারিওজেনেসিস (Baryogenesis) নামের একটি অজানা বিক্রিয়া ব্যারিয়ন সংখ্যার সংরক্ষণ নীতি ভঙ্গ করে

এন্টিকোয়ার্ক ও এন্টি-লেপ্টন এর তুলনায় কোয়ার্ক ও লেপ্টনের পরিমাণ সামান্য বাড়িয়ে দেয়। এই পরিমাণটি ছিল প্রতি ৩০ মিলিয়ন-এ ১টি। অর্থাৎ এন্টি-কোয়ার্ক এর সংখ্যা ৩০ মিলিয়ন হলে কোয়ার্ক-এর সংখ্যা ছিল ৩০ মিলিয়ন ১টি। মহা বিস্ফোরণের আনুমানিক ১ সেকেন্ড পর নিউট্রিনোগুলো বিযুগলায়িত (decoupled) হয়ে পুরো মহাবিশ্ব জুড়ে ভ্রমণ শুরু করে। ফোটনগুলোর যখন আর প্রোটন এন্টি-প্রোটন জোড় তৈরির মতো শক্তি অবশিষ্ট রইল না তখন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কারণে তাপমাত্রা কমে যেতে শুরু করে। আর বিকিরণের মাধ্যমে প্রোটন ও নিউট্রন তাপীয় সাম্যাবস্থা থেকে বিচ্যুত হল। এর ৪-১০ সেকেন্ড এর মধ্যে তাপমাত্রা এতো কমে গেল যে ইলেকট্রনগুলোও আর তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকল না।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রথম ৩ মিনিটে ব্যারিয়ন-ফোটন অনুপাত ছিল ধ্রুবক, এ সময়ই ব্যারিয়ন দিয়ে তৈরি কয়েক ধরনের আদিম কেন্দ্রীন তথা নিউক্লিয়াস-এর উদ্ভব ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল প্রোটন এবং হিলিয়াম-এর কেন্দ্রীন। সাথে সামান্য পরিমাণ ডিউটেরিয়াম (ভারি হাইড্রোজেন), ট্রিটিয়াম এবং লিথিয়াম (Li^7) ও ছিল। দুই মিনিটের মাথায় তাপমাত্রা এতো কমে গিয়েছিল যে কেন্দ্রীন সংযোজন (নিউক্লিয়ার ফিউশন) বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোটন ও নিউট্রন একত্রিত হয়ে পারমাণবিক কেন্দ্রীন গঠন শুরু করে। প্রথমে তৈরি হয় ডিউটেরিয়াম, এরপর হিলিয়াম, এবং এর কিছুক্ষণ পর লিথিয়াম ও বেরিলিয়াম-এর কেন্দ্রীন। এই কেন্দ্রীন সংশ্লেষ অবশ্য বেশিক্ষণ চলতে পারেনি, ১৭-৩০ মিনিটের মতো চলেছিল। এরপর মহাবিশ্বে আর কেন্দ্রীন সংযোজন বিক্রিয়া ঘটানোর মতো যথেষ্ট তাপ ছিল না। কেন্দ্রীন সংশ্লেষ যুগ এর শেষে সকল প্রোটন ও নিউট্রনই একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। একত্রিত হয়ে এরা মূলত হিলিয়াম তৈরি করেছিল। আদিম হালকা পদার্থের শতকরা ২৪ ভাগই ছিল হিলিয়াম। ভর হিসেব করলে হিলিয়াম আয়ন-এর তুলনায় প্রোটন ছিল তিন গুণ। তাপীয় পরিবেশ এবং প্রদত্ত সময়ই প্রোটন, নিউট্রন, ডিউটেরিয়াম ইত্যাদির সংখ্যা নির্ধারণ করেছিল। বর্তমানে হালকা পদার্থের প্রাচুর্য বিবিএন যুগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোরই ফসল। তাই এটি বিবিএন যুগে ব্যারিয়ন-এর ঘনত্ব এবং মহাবিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা দেয়।

মহা বিস্ফোরণ কেন্দ্রীন সংশ্লেষ কণা পদার্থবিজ্ঞানের "প্রমিত মডেল' দ্বারা সমর্থিত। উল্লেখ্য, প্রমিত মডেল চারটি জানা মৌলিক বল বা মিথস্ক্রিয়া এবং এসব ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী মৌলিক কণাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এই মডেল অনুসারে, আমাদের মহাবিশ্বের দৃশ্যমান পদার্থের অধিকাংশই ব্যারিয়ন দিয়ে গঠিত।

বিকিরণ ও পুনর্মিলন যুগ

মহাবিশ্বে তখনও ফোটনের আধিপত্য ছিল। এসব ফোটন পরবর্তী ৩০০,০০০ বছর ধরে আয়নিত প্রোটন, ইলেকট্রন ও কেন্দ্রীন-এর সাথে অবিরাম মিথস্ক্রিয়া চালিয়ে গেছে। ফোটনগুলো টমসন বা কম্পটন বিচ্ছুরণের মাধ্যমে মুক্ত প্লাজমা কণা থেকে বিচ্ছুরিত হতো এবং এদের গড় মুক্ত পথ ছিল খুব ছোট। তাই প্লাজমার পুরো শক্তিই ফাঁদে আটকে গিয়েছিল, যে কারণে প্লাজমা ছিল বিকিরণের প্রতি অনচ্ছ। এই যুগকে বলা হয় বিকিরণ প্রভাবিত যুগ বা ফোটন যুগ (ইপকা)। এ যুগে বিকিরণ-এর তাপমাত্রা পদার্থের তাপমাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

ফোটন যুগে প্রথমে আয়ন এবং পরবর্তীতে নিরপেক্ষ পরমাণুর জন্য পুনর্মিলন (Recombination) প্রক্রিয়া শুরু হয়। পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান নির্ণয় করেছে, হাইড্রোজেন নয় বরং একটি ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট হিলিয়াম আয়নই (He^+) ছিল প্রথম সৃষ্ট পরমাণু। এই ইলেকট্রন-আয়ন মিলন প্রক্রিয়াকে নিচের বিক্রিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরা যায় :

$$He^{2+} + e \rightarrow He^+ + hv$$

প্রথম পারমাণবিক প্রজাতি He^+ হওয়ার কারণ, যখন কেন্দ্রীন এবং ইলেকট্রন সম্পূর্ণ আয়নিত অবস্থায় মুক্ত ছিল তখন প্লাজমার তাপমাত্রা ছিল অনেক বেশি। হিসাব মতে যার আয়নীকরণ শক্তি (E_{ip}) সবচেয়ে বেশি তারই সবার আগে পারমাণবিক প্রজাতিতে পরিণত হওয়ার কথা। He^+, হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন এর আয়নীকরণ শক্তি তুলনা করলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়,

E_{IP} (He^+) = Z^2 = ৪ Ryd = ৫৪ ইলেকট্রন ভোল্ট

E_{IP} (He) = ১.৮ Ryd = ২৪.৬ ইলেকট্রন ভোল্ট

E_{IP} (H) = Z^2 = ১ Ryd = ১৩.৬ ইলেকট্রন ভোল্ট

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে, He^+ অনেক উচ্চ তাপমাত্রায়ও টিকে থাকতে পারে, অন্তত নিরপেক্ষ হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন-এর তুলনায়। তার মানে আদ্যিকালের অতি উচ্চ তাপমাত্রায় He^+ থাকার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। নিরপেক্ষ হাইড্রোজেন গঠিত হওয়ার ২৪০,০০০ বছর আগেই He^+ গঠিত হয়েছিল, আর হাইড্রোজেন-এর উদ্ভব ঘটেছে আরও পরে।

প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব কমতে থাকে, এর ফলেই এক সময় ইলেকট্রন ধারণ (capture) এর মাধ্যমে নিরপেক্ষ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম তৈরির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শক্তিতে পার্থক্যের কারণে হাইড্রোজেন-এর তুলনায় হিলিয়াম-এর ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি দ্রুততর। ২৪০,০০ থেকে ৩১০,০০০ বছর পর্যন্ত সময়টিকে বলা হয় পুনর্মিলন যুগ। আদিমকালে হালকা মৌলসমূহের আপেক্ষিক প্রাচুর্য বোঝার জন্য এই যুগ নিয়ে গবেষণা করা বেশ জরুরি। সে যুগে সংখ্যার দিক দিয়ে H:He এর অনুপাত ছিল প্রায় ৯৩:৭, আর ভরের দিক দিয়ে প্রায় ৭৯:২৪। বর্তমানে অনেক অনেক তারার অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত যে পরিমাণ হিলিয়াম উৎপন্ন হচ্ছে তার তুলনায় মহা বিস্ফোরণের পরের ৩ মিনিট সময়ে অনেক বেশি হিলিয়াম উৎপন্ন হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সে যুগে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তাতে বর্তমান মহাবিশ্বের সমগ্র হিলিয়াম ভাণ্ডারের ৯৮% তৈরি হতে পারতো। মহাবিশ্বে প্রতি ৯টি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের বিপরীতে ১টি করে হিলিয়াম কেন্দ্রীন রয়েছে। পুনর্মিলন যুগের দশা একটু ভিন্ন হলে এই অনুপাতও ভিন্ন হতো। আমরা জানি মহাবিশ্বের অধিকাংশ হাইড্রোজেনই তার স্বাভাবিক দশায় আছে, ডিউটেরিয়াম বা ট্রিটিয়াম-এর মতো ভারি অবস্থায় নেই। তারার অভ্যন্তরে কোন ডিউটেরিয়াম তৈরি হয় না, এটি কেবল ধ্বংসই হয়। তাই ডিউটেরিয়াম-এর বর্তমান পরিমাণ আদিম কেন্দ্রীন সংশ্লেষ-এর সময় উপস্থিত ডিউটেরিয়াম-এর পরিমাণে একটি নিম্নসীমা বেঁধে দেয়, একইসাথে ব্যারিয়ন-এর ঘনত্বেও একটি নিম্নসীমা তৈরি হয়ে যায়। আদি মহাবিশ্বে কী ঘটেছিল সে বিষয়ক যেকোনো মডেলকে অবশ্যই মৌলসমূহের বর্তমান প্রাচুর্যের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হতে হবে। উত্তপ্ত মহা বিস্ফোরণ আমরা বর্তমানে যা দেখছি তা ব্যাখ্যা করতে পারে, আর মৌলের প্রাচুর্য মহাবিশ্বের ব্যারিয়ন ঘনত্বের আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাপে সাহায্য করে।

পরমাণু কেন্দ্রীনের সাথে ইলেকট্রন মিলিত হয়ে যা তৈরি করেছে তা-ই পরবর্তীতে তারাসমূহের বীজ হিসেবে কাজ করেছে। জীবন সৃষ্টিকারী কার্বন, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন থেকে শুরু করে লোহা, তামা এবং স্বর্ণের মতো ধাতব পদার্থ ইত্যাদি সবকিছুই তারার জীবনচক্রের বিভিন্ন ক্ষণে সৃষ্টি হয়েছে। তারার জন্ম এবং মৃত্যুর চক্রেই বাঁধা পড়েছে তাদের উদ্ভব। যত বেশি পদার্থ গঠিত হয়েছে ততই বিভিন্ন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বস্তু গঠনের হার বেড়েছে। একে একে জন্ম হয়েছে ছায়াপথ, নবতারা, কৃষ্ণবিবর, তারা, গ্রহ ইত্যাদির।

প্রসরমান মহাবিশ্ব

বিজ্ঞানী এডুইন হাবল আবিষ্কার করেছিলেন যে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। এ বিষয়ে তার তত্ত্বটি হাবল নীতি নামে সুপরিচিত। এই নীতি মহা বিস্ফোরণকে সমর্থন করে। মহাবিশ্ব এক সময় কেবল একটি বিন্দু উৎস ছিল, সেখান থেকে দীর্ঘদিনের প্রসারণ ও শীতলায়ন শেষে সে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে—এই চিত্র হাবল নীতির সাথে খুব মিলে যায়।

সমরূপ এবং সমসত্ত্ব মহাবিশ্বের সমমুখী প্রসারণ থেকে বোঝা যায়, অনেক দূরের কোনো বস্তু থেকে আসা বিকিরণ পর্যবেক্ষক থেকে ধ্রুব বেগে (v) পেছনের দিকে সরে যাবে। পরীক্ষণের মাধ্যমে হাবল নীতির এই সূত্রটি নির্ণয় করা হয়েছে,

$$v(t) = H_0 \times d(t)$$

যেখানে, d হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট t (লুক-ব্যাক সময়) সময়ে দূরত্ব এবং H_0 হচ্ছে হাবল ধ্রুবক। হাবল ধ্রুবকের সাধারণ্যে গৃহীত মান হচ্ছে ৬৭ কিলোমিটার/সেকেন্ড/মেগাপারসেক। যেহেতু রৈখিক হাবল সম্পর্কে H_0 মানের একটি আনতি থেকে সেহেতু এর বিপরীত অর্থাৎ $^1/_{H0}$ নিলেই তা সময়ের মাত্রায় চলে যাবে এবং এভাবে সরাসরি মহাবিশ্বের বয়স বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে হাবল নীতি সমবেগে প্রসারণ ধরে নেয়, কিন্তু বাস্তবতায় (ক) প্রকৃত বেগ নির্ণয় করা হয় মহাকর্ষের পেছনে দায়ী মোট বস্তুর পরিমাণের মাধ্যমে এবং (খ) পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে বর্তমানে ছায়াপথসমূহের ত্বরণ হচ্ছে। এই দুটি পরিমাণই মহাজাগতিক ধ্রুবকের ওপর নির্ভর করে বিশেষত, মহাবিশ্বে পদার্থের ঘনত্ব এবং শক্তির

ঘনত্বের ওপর। মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি, অর্থাৎ এটি কেবল প্রসারিতই হতে থাকবে, নাকি এক সময় স্থির অবস্থায় পৌঁছুবে, নাকি আবার সংকুচিত হয়ে একটি মহা সংকোচন ঘটাবে তা এর মধ্যকার ব্যারিয়নীয় পদার্থের ঘনত্বের ওপরই নির্ভর করে।

মহাজাগতিক অনুতরঙ্গ পটভূমি

মহাজাগতিক অনুতরঙ্গ পটভূমি (Cosmic microwave background-CMB) বিকিরণকে বলা হয় মহাবিশ্বের সৃষ্টিলগ্নের ধ্বংসাবশেষ। এই বিকিরণ সকল দিকে সমানভাবে বিরাজমান, কোন দিকে কী পরিমাণ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বস্তু বা পদার্থ আছে তার ওপর এটি একেবারেই নির্ভর করে না। খুব মৃদু পটভূমি আভা হিসেবে এই বিকিরণকে চিহ্নিত করা যায়। সিএমবি হচ্ছে পুনর্মিলন যুগে নিরপেক্ষ পরমাণু গঠিত হওয়ার পর সৃষ্ট স্বচ্ছ মহাবিশ্বের ফল। পুনর্মিলন যুগে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা মাত্র ৩০০০ কেলভিনে নেমে এসেছিল! নিরপেক্ষ পরমাণু তাপীয় বিকিরণ শোষণ করতে পারে না। এ কারণে মহাবিশ্বের সকল পদার্থ বিকিরণের প্রতি স্বচ্ছ হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা বিকিরণ শোষণ করে কোনো বাধার সৃষ্টি করতো না, তাদের মধ্য দিয়ে বিকিরণ স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারতো। ফোটন যুগে পদার্থ ও বিকিরণের তাপীয় ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করতে শুরু করে। সেই তখন থেকেই ফোটনগুলো মহাবিশ্ব জুড়ে সঞ্চালিত হচ্ছে, তাদের সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন হয়নি। একই পরিমাণ ফোটন দিন দিন অপেক্ষাকৃত বেশি স্থান দখল করায় স্বভাবতই তারা আগের চেয়ে অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। এই ফোটনগুলোকেই বলা হয় সিএমবি বিকিরণ বা সিএমবিআর। তাই বলা যায়, সিএমবি হল পুনর্মিলন যুগের শেষে মহাবিশ্বের একটি ছবি। সিএমবিআর ২.৭২৫ কেলভিন তাপমাত্রার একটি তাপীয় কৃষ্ণ বস্তুসদৃশ বর্ণালি প্রদর্শন করে। এই বর্ণালীর সর্বোচ্চ মান পাওয়া যায় ১৬০.২ গিগাহার্জ কম্পাঙ্ক তথা ১.৯ মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে। এই কম্পাঙ্ক বর্ণালীর অনুতরঙ্গ তথা মাইক্রোওয়েভ অংশে পড়ে। এ জন্যই নামের মধ্যে অনুতরঙ্গ শব্দটি রয়েছে। ১৯৪০-এর দশকে যে গবেষণার সূচনা ঘটেছিল তা-ই

চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে ১৯৬৪ সালে এসে। এই বছর রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন সিএমবি আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের জন্য তারা ১৯৭৮ সালে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সিএমবি আভা সবদিক থেকে প্রায় সমানভাবেই আসে, তবে একে পুরোপুরি সুষম বলা যাবে না। কোনো একটি লাল-উত্তপ্ত এবং বিস্ফোরণোন্মুখ গ্যাসপিণ্ডের মধ্যে ঘটতে থাকা আকস্মিক এবং অনিয়মিত ঘটনাগুলো যদি পুরো মহাবিশ্বের আকারের সাথে তুলনীয় হয় তবে সেদিক থেকে আসা সিএমবি আভায় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিএমবি বিকিরণে বিষমরূপতা (Anisotropy) পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিককালে এ ধরনের বিষমরূপতা "উইলকিনসন মাইক্রোয়েভ এনাইসোট্রপি প্রোব" (WMAP-ডব্লিউম্যাপ) এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা গেছে। পুনর্মিলন যুগের পূর্বে ফোটনের সাথে কণার কম্পটন বিচ্ছুরণের কারণে তখন পর্যন্ত সমরূপ থাকা সিএমবি বিকিরণে কিছু বিষমরূপতার জন্ম হয়েছে। এই ক্রিয়াকে বলা হয় সানিয়েভ-জেলদোভিচ ক্রিয়া (Sunayev-Zeldovich effect, SZ effect)। ২০০৯ সালে প্ল্যাংক (PLANCK) নামক আরেকটি সন্ধানী যান মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে আরও সূক্ষ্মভাবে সমগ্র আকাশের বিষমরূপতা পরিমাপের জন্য।

মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্বকে সমরূপ ধরে নিলে এই পশ্চাদপসরণ বেগের কারণে স্থির কাঠামোর সাপেক্ষে যেকোনো উৎস থেকে আসা বিকিরণের মধ্যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন ডপলার ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। উৎস থেকে পর্যবেক্ষকের কাছে আসার পর বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য লাল-এর দিকে সরে যায় বলে লাল সরণের সাথে সহজেই তাপমাত্রার সম্পর্ক তৈরি করা যায়। লাল সরণকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে,

$$z = [\lambda(obs)-\lambda(rest)]/_{c} = v/_{c}$$

$z>0$ এর জন্য মহাবিশ্বের কার্যকরী তাপমাত্রা এভাবে প্রকাশ করা যায়,

$$T(z) = T_0(1+z)$$

পুনর্মিলন যুগে তাপমাত্রা ছিল ৩০০০ কেলভিন। সেই তাপমাত্রার প্রায় ১০০০ ভাগ লাল সরণ ঘটেছে, যার ফলে বর্তমানে তাপমাত্রা এসে দাঁড়িয়েছে ২.৭২৫ কেলভিনে। মহাজাগতিক অনুতরঙ্গ পটভূমির এই তাপমাত্রা উপযুক্ত সমীকরণের মাধ্যমেই প্রমাণ করা যায়। সমীকরণে T_0 হচ্ছে ২.৭২৫ কেলভিন, যা $z=0$ অর্থাৎ বর্তমান যুগের পটভূমির তাপমাত্রা। এই নিম্ন তাপমাত্রায় কৃষ্ণ বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তাপমাত্রা অনুতরঙ্গ অঞ্চলে আছে। সংজ্ঞা অনুসারে, সিএমবি তাপমাত্রা লাল সরণের সাথে রৈখিকভাবে বৃদ্ধি পায়। বিকিরণ থেকে পদার্থ দ্বারা প্রভাবিত মহাবিশ্বে পরিবর্তনটি ঘটেছিল $z \sim ৩৫,০০০$ তথা $T(z) \sim ১০^৫$ কেলভিনে। মহাজাগতিক মডেল-এর মাধ্যমে এর একটি আনুমানিক সময়সীমা বের করা হয়েছে, মহা বিস্ফোরণের ৩০০০ বছর পর।

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বস্তু

কালপুরুষ নীহারিকা, তারাসমূহের জন্মস্থান

তারার জন্ম এবং বিবর্তনের জন্য কেমন শর্ত প্রয়োজন তা বুঝতে হলে সূর্যকে বোঝার বিকল্প নেই। আমাদের থেকে তারাসমূহের নিকটতম জন্মস্থান ১,৫০০ আলোকবর্ষ দূরে, নাম কালপুরুষ নীহারিকা। তারা গবেষণার জন্য এই মহাজাগতিক মেঘটিকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়। কালপুরুষ তারামণ্ডলে অবস্থিত তিনটি তারার ঠিক নিচেই এই নীহারিকাটি অবস্থিত। একই রেখায় অবস্থিত এই তিনটি তারার সুবাদেই আকাশে কালপুরুষ নীহারিকা চিহ্নিত করা বেশ সহজ। আকাশে তারাগুলোকে সহজে চিহ্নিত করার জন্যই এগুলোকে বিভিন্ন তারামণ্ডলে ভাগ করা হয়েছিল, মণ্ডলগুলো সবই বিভিন্ন বস্তু, জীবন বা চরিত্রের আদলে কল্পনা করে নেয়া হয়েছে, এদের কোনো বাস্তব কাঠামো নেই। কালপুরুষ তারামণ্ডলকে একজন শিকারীর আদলে কল্পনা করা হয়েছিল।

কালপুরুষ বন্ধনীর ঠিক নিচেই একটি লালাভ কুণ্ডলী হিসেবে কালপুরুষ নীহারিকাটি দেখা যায়। এই নীহারিকার বিস্তৃত ছবি তুলেছে নাসা-র দুটি মহাকাশ দূরবীন, স্পিৎজার এবং হাবল।

কৃষ্ণবিবর–অপরিমেয় শক্তির আধার

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বস্তুগুলোর মধ্যে কৃষ্ণ বস্তুর দিকে আমাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি কারণ এর অভ্যন্তরে রয়েছে অপরিমেয় শক্তি যা ছায়াপথকে স্থিতিশীল থাকতে সাহায্য করে কিংবা আশপাশের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বস্তুগুলোতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। তীব্র মহাকর্ষ শক্তির মাধ্যমে এই বস্তুগুলো আশপাশের পদার্থগুলোকেই যে কেবল নিজের ভেতর টেনে নেয় তা নয় বরং পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া আলোও বন্দি করে ফেলে। অধিকাংশ ছায়াপথের কেন্দ্রেই একটি কৃষ্ণবিবর আছে এবং এই বিবরই তার কার্যক্রম অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। কৃষ্ণবিবর থেকে আলোও পালাতে পারে না, কিন্তু এসব বস্তুর আশপাশ থেকে প্রচুর পরিমাণ শক্তিশালী এক্স-রশ্মি বিকিরিত হয় যার মাধ্যমে এদেরকে চিহ্নিত করা যায়। চারদিকের বিপুল পরিমাণ পতনশীল বস্তু মাধ্যমেও এদের অবস্থান বোঝা সম্ভব। কৃষ্ণবিবরের চারদিকে কুণ্ডলাকারে ঘূর্ণায়মান এবং পতনশীল অত্যন্ত উত্তপ্ত আয়নিত কণা থেকেই এক্স-রশ্মি বিকিরিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন কৃষ্ণবিবর থেকে বিশাল ছায়াপথের অন্যান্য স্থানে শক্তি পরিবহনের ক্ষেত্রে এই জেটগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরা এমনকি ছায়াপথের বিভিন্ন স্থানে কি হারে তারার জন্ম হবে তাও নিয়ন্ত্রণ করে।

বিশালাকার তারাগুলোর বিবর্তনের শেষে যে উৎপাদ তৈরি হয় সেটাই কৃষ্ণবিবর। ছায়াপথের বিভিন্ন যুগল তারা জগতের অভ্যন্তরে অসংখ্য ছোট

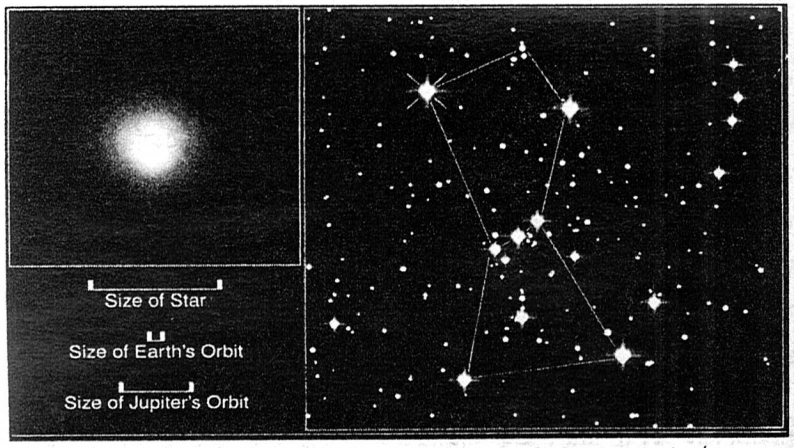

কালপুরুষ তারামণ্ডলের কাল্পনিক ছবি। শিকারী কালপুরুষ। এক রেখায় থাকা তিনটি তারা তার বেল্ট গঠন করেছে।

ছোট কৃষ্ণবিবর আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটি হচ্ছে "জিআরও জে ১৬৫৫-৪০" (GRO J1655-40) যুগল তারা জগত, চন্দ্র মহাকাশ দূরবীনের মাধ্যমে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে কিভাবে যুগল তারা জগতের একটি কৃষ্ণবিবর তার সঙ্গী তারাটিকে শুষে নেয়। পদার্থগুলো কৃষ্ণবিবরের চারদিকে কুণ্ডলাকারে ঘূর্ণন শুরু করার আগে একটি বায়ুপ্রবাহের রূপ নেয়। এই বায়ুর কারণে সৃষ্ট সরু এক্স-রশ্মি রেখার মাধ্যমে বোঝা যায় সেখানে প্রচণ্ড আয়নিত অবস্থায় ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকন, লোহা, নিকেল ইত্যাদি মৌল আছে।

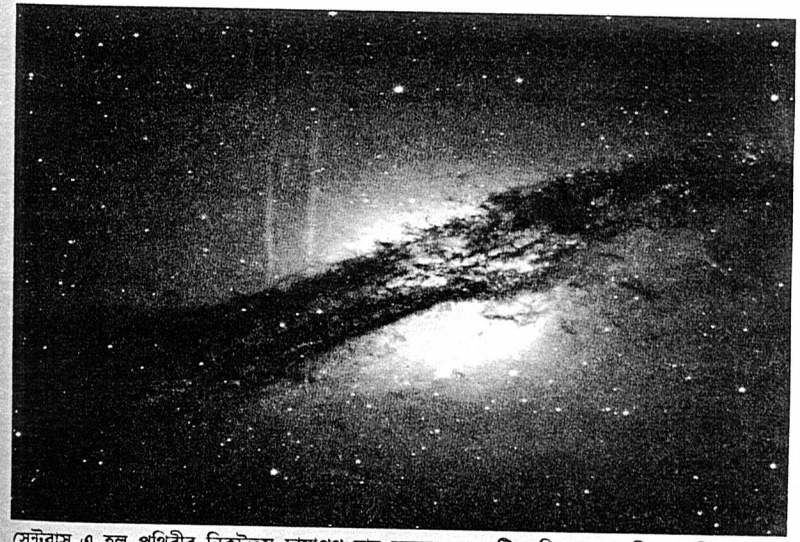

সেন্টরাস-এ হল পৃথিবীর নিকটতম ছায়াপথ যার অভ্যন্তরে একটি অতিবৃহৎ কৃষ্ণবিবর অবিরাম জেট নিক্ষেপ করে চলেছে। চন্দ্র মহাকাশ দূরবীন দিয়ে এটি দেখা হয়েছে।

অতিনবতারা অবশিষ্টাংশ–ভারি মৌলের উৎস

অতিনবতারার অবশিষ্টাংশ নিয়ে গবেষণা করাও খুব জরুরি কারণ এরা গ্রহ তৈরির ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ স্থান হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দিয়ে পূর্ণ থাকলেও গ্রহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ভারি মৌল পাওয়া যায়। এরকম ভারি মৌল যেমন, জিরকোনিয়াম, স্বর্ণ, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি অতিনবতারার বিস্ফোরণের সময় গঠিত হয়। আমাদের পৃথিবীতে প্রায় সব ধরনের মৌলই আছে, কারণ পূর্ববর্তী অনেকগুলো প্রজন্মের অতিনবতারা

অবশিষ্টাংশের ভগ্নাবশেষ থেকেই তার জন্ম হয়েছে। তিনটি দূরবীন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে একটি অতিনবতারার অবশিষ্টাংশ যার নাম "ক্যাসিওপিয়া এ"। স্পিৎজার দূরবীনের মাধ্যমে একে অবলোহিত (লাল) আলোয় দেখা হয়েছে, হাবল দিয়ে দেখা হয়েছে দৃশ্যমান (হলুদ) আলোর মাধ্যমে আর চন্দ্র দিয়ে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এক্স-রশ্মি (সবুজাভ নীল) ব্যবহার করা হয়েছে। ক্যাসিওপিয়ার মতো একটি প্রমিত অতিনবতারা অবশিষ্টাংশের মধ্যে থাকে : বহিস্কৃত পদার্থে তৈরি একটি অত্যুজ্জ্বল বহিঃস্থ স্তর এবং এককালে বিশাল আকারবিশিষ্ট একটি তারা দিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় কঙ্কাল। এ ধরনের তারাকে বলে নিউট্রন তারা।

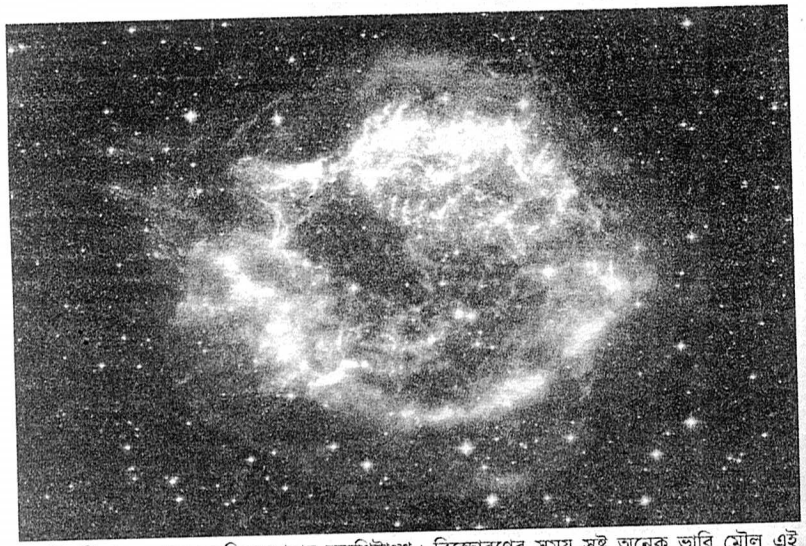

ক্যাসিওপিয়া এ নামক অতিনবতারার অবশিষ্টাংশ। বিস্ফোরণের সময় সৃষ্ট অনেক ভারি মৌল এই অবশিষ্টাংশে থাকে।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ : খান মুহাম্মদ

মহাকাশের পরিচিতি

ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী

জ্যোতির্বিজ্ঞান হলো মহাকাশে দৃশ্যমান বস্তুসমূহের গতি, আকার, ভর, ভৌতপ্রকৃতি, রাসায়নিক গঠন এবং এদের উৎপত্তি ও বিবর্তন সংক্রান্ত বিজ্ঞান। মহাজাগতিক বস্তু বলতে গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, ছায়াপথস্তবক এবং এদের মধ্যে বা বাইরে যা কিছু আছে সব কিছুই বোঝায়। এটি একটি পর্যবেক্ষণনির্ভর বিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তুলনায় এটি অধিকতর জনপ্রিয়। আর সেজন্যেই এক্ষেত্রে সৌখিন জ্যোতির্বিদদের অনেক অবদান আছে এবং থাকবে। অসীমের প্রতি মানুষের কৌতূহল দুর্নিবার। এই দুর্নিরীক্ষ অন্তরিক্ষের জ্ঞান অর্জনে জ্যোতির্বিজ্ঞানই মানুষের প্রধানতম সহায়। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান তাই আজ একটি ব্যাপক বিষয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যান্য উপবিভাগ হলো : গোলকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান (spherical astronomy),

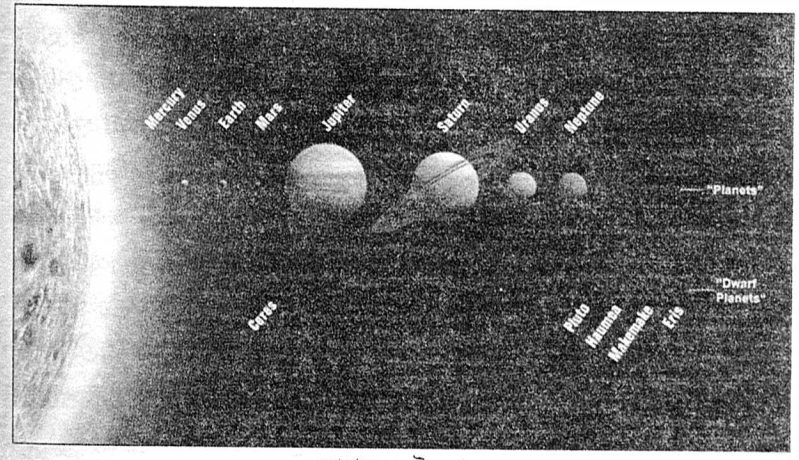

আমাদের সৌরজগৎ